উত্তর। চিঠিপত্র বলতে আমরা বুঝি কোনও প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে লিখিত আপন অভিজ্ঞতার বর্ণনা কিংবা দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনার বিবৃতি দান। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র মূলত তারই প্রতিনিধিত্ব করেছে। যেকথা তিনি তার প্রিয়জনকে কাছে ডেকে বলতে পারতেন তা তিনি পত্রাকারে লিপিবন্ধ করেছেন। তবে যেকথা সরাসরি মুখে বলতে গিয়ে রসভঙ্গের ভয় আছে সেখানে পত্রের দ্বারস্থ হতেই হয়। স্নেহের ভাইঝি ইন্দিরা দেবী ওরফে বিবিকে এই রূপ দৈনন্দিন খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা দাখিল করেছিলেন। 'তখন কে জানতো নিত্যকার লেখা পত্রগুলি পরবর্তীকালে পত্রসাহিত্য হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে? তবে একথা মানতে হয়, পত্র শুধুমাত্র খবর দেওয়া নেওয়া মাধ্যম না হয়ে যদি সাহিত্য গুণ সমন্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে পত্রসাহিত্য হিসাবে মেনে নেওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কেবল তাঁর দৈনন্দিন চিত্র পত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেননি তা একটা বিশিষ্ট শিল্পকলায় উন্নীত হয়ে অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত হয়েছে। এখন এসব পত্র ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র হয়ে নিজস্ব গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। এ যেন আপামর জনসাধারণের মনের ভাব-অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে। আর এই ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে একমাত্র তাঁর রচনা রীতি, ভাষা শিল্পের বৈভব, এবং গদ্যরীতির অমর স্পর্শে।

আমরা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করতে পারি চিঠিপত্রের ভাষা হবে চলিত রীতির গদ্য অর্থাৎ কথ্য রূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যাবে তাঁর—সাধু রীতি এবং চলিত রীতি কত অঙ্গাঙ্গিভাবে অথবা ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিল। একমাত্র ব্যাকরণের বিচারে সাধু ও চলিতের পার্থক্য নির্ণিত হয়ে থাকে ক্রিয়াপদ শব্দ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই পার্থক্য অনেকাংশে বজায় থাকলেও তা বাহ্যিক আবরণমাত্র, আভ্যন্তরীণ দিক থেকে সাধু রীতি ও চলিত রীতি উভয়েই কাছাকাছি অবস্থান করেছে তা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই নতুন লক্ষণের উদ্ভব, এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হয়েছিল মূলত প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকার জন্য। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি এক স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র রচনা করেন, যেখানে তিনি কারুর দ্বারা প্রভাবিত হননি। যেমন একই সময়ে রচিত তাঁর দুখানি উপন্যাস—'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' দুরকম রীতি নিয়ে এলেও কবি বুদ্ধদেব বসুর মতে—'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস ; ঘরে বাইরে চলিত ভাষায় প্রথম, কিন্তু এই অমিলের মধ্যেও একটি মিল প্রচ্ছন্ন রয়েছে। চতুরঙ্গের সাধুভাষায় চলিত ভাষার অনেক গুণই বর্তমান, ঘরে বাইরের চলিত ভাষা অনেকাংশেই সাধুভাষা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের লেখায় কোনো নির্দিষ্ট পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে না। যদি ক্রিয়াপদকে পার্থক্য নির্ণয়ের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে তাঁর ছিন্নপত্র চলিত গদ্য রীতিতেই লেখা, কিন্তু শব্দ বিন্যাস, ভাষা-শৈলী, গতি প্রকৃতি দেখে কোনোমতেই বোঝা সম্ভব নয় কোন্‌টি সাধু রীতি কোন্‌টি চলিত রীতি। এই মর্মে তাঁর রচিত পত্র থেকে উদাহরণ তুলে উক্তিটির সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। তিনি এক স্থানে লিখেছেন—"একটি ছোটো মেয়ে। খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুল খেলায় বোধহয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে সে একে পিটিয়েও দিত।" (৩১) এই চলিত রীতি দেখে পরবর্তী উদাহরণটা পড়ে কখনোই মনে হবে না সাধু এবং চলিত রীতিকে তিনি আলাদা আলাদাভাবে গ্রহণ করেছিলেন—"তখন শরৎ সূর্যলোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকতো, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়তি অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত আদিম পৃথিবীর ভাব। (৬৪) আসলে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর সৌকুমার্য প্রকাশ পেয়েছে সাধু-চলিতের রীতি গ্রহণ করে নয়, শব্দ নির্বাচনে, উপমা সৃষ্টিতে কিংবা চিত্রকল্প রচনার মধ্য দিয়ে।

কালিদাস সাধারণ কবি থেকে মহাকবিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন মূলত এই উপমা চিত্রকল্প, রচনার মধ্য দিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ সর্বদা কালিদাসের গুণকীর্তনে মুখর ছিলেন, তার অধিকাংশ কবিতা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে কালিদাসের অটুট মহিমা কীর্তন। তবে কালিদাস তার একাধিপত্য বিস্তার করেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যকে অবলম্বন করে। আর বাংলায় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যা দিয়ে গেছেন তা চিরকালের জন্য ভাস্বর হয়ে থাকবে। গল্প-গানে-কবিতা-নাটকে উপন্যাসে এমনকি প্রবন্ধ সাহিত্যের সারা অবয়ব জুড়ে বিচিত্র উপমাচিত্রকল্পের সমাহার সেখানে তাঁর ছিন্নপত্র কেবল পত্র হিসাবে লিখিত হবে এটা কখনোই আশা করা সম্ভব নয়। তাঁর প্রতিটি পত্রের ছত্রে ছত্রে উপমা, চিত্রকল্প, শব্দ নির্বাচন চোখে পড়ে। যেমন এক স্থানে তিনি লিখেছেন—"কণ্ঠস্বর হু-হু করতে করতে দশদিকে ছুটে গেল, কিন্তু কারো সাড়া পেলুম না, তখন বুকটা হঠাৎ চারিদিক থেকে দমে গেল, একখানা বড়ো খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করলে যেমনতর হয়।" (১০) কিংবা, "সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা উলটে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য শিখন।" (১০) এসবের মধ্যে কোন্‌টি উৎপ্রেক্ষা কোন্‌টি সমাসোক্তি তা অলংকার নির্ণয়ের বর্ণিতব্য বিষয় কিন্তু রসিক মানুষ বুঝবেন এটি

উপমামাত্র, আর এই বড়ো অথচ সুন্দর উপমা ফুটতে পারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো বড়ো লেখকের হাতেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বিপুল পত্ররাজির মধ্যে উপমা এনেছেন নানাভাবে, কখনো বৃষ্টিকে, কখনো ঝড়কে, কখনো জ্যোৎস্না, সূর্যোদয়, সূর্যাস্তকে দেখে। আবার কখনো সমুদ্রের তাণ্ডব রূপ দেখে, কখনো স্রোতস্বিনীর অপূর্ব শোভা দেখে কিংবা গ্রাম বাংলার বৈচিত্র্যময় রূপ দেখে বিভিন্ন রকমের উপমা চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। একস্থানে সাদামাটা মেঘের বর্ণনা দিতে গিয়ে সুললিত উপমার দ্বারস্থ হয়েছেন। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে 'ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ' যা দেখে তিনি বললেন—"মেঘগুলোর এমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছি যে, বাবুদের মতো দিব্যি সজল শ্যামল টেবো টেবো নধর নন্দন ভাব।" কত সহজ ভাষায় কী আশ্চর্য সুন্দর বর্ণনার মধ্য দিয়ে অপূর্ব উপমার আমন্ত্রণ ঘটিয়েছেন। কেবলমাত্র প্রিয়জনকে লেখা 'পত্র', সেই পত্রের মধ্য এত সুন্দর অথচ স্বাভাবিক চিত্রকল্পে উপমার দ্বারা সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছিন্নপত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রথম জানালেন। ঝড়ের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন,—"কাল সমস্ত রাত্রি তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মতো হু-হু করে কেঁদেছিল।" (৮৭) কিংবা, "ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাঁপুড়ের মতো বাঁশি বাজাতে লাগলো।" (১৪)

এই মেঘ ও ঝড় বৃষ্টির পরিচয় বিশেষ উপমা সহযোগে বর্ণনা করেছেন তেমনি প্রকৃতির অন্যান্য রূপকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সূর্যাস্তের বর্ণনায় লিখেছেন—পশ্চিম দিগন্ত যেন, "আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধুর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে।" (১৪) আর পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের বর্ণনায় লিখেছেন—"সূর্য আস্তে আস্তে ভোরেরবেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে।" (১০) নদীর অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখেছেন—"নদী ও তীর উভয়ের আকার প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে, দুটি অল্প বয়সের ভাই বোনের মতো।" (১৯) জ্যোৎস্নাকে অবলম্বন করে লেখক বিচিত্র যেসব উপমা সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর বিভিন্ন পত্রে ছড়িয়ে রয়েছে—"প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদ শোকের ভাব মনে আসে; যেন একটি মধুময় বৃহৎ গোরের উপর একটি সাদা কাপড় পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিত প্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।" (৯৯) এ বক্তব্যের উপমা নির্বাচন ও রচনাশৈলী অনুপম সংগীত মূর্চ্ছনার ন্যায় বিরাজ করছে।

ছিন্নপত্র অবলম্বনে লেখকের ভাষা শৈলী, গদ্য শৈলী কিংবা রচনা রীতির পরিচয় উদ্ঘাটনে উপমা চিত্রকল্পের অজস্র উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয়ে পাঠককে বিস্ময়ে আপ্লুত করে তোলে তা হল একটা পত্রের মধ্য দিয়ে তিনি কীভাবে এমন প্রতিভার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন? রবীন্দ্রনাথ যে কত কল্পনাপ্রবণ কবি ভাবুক সাহিত্যিক পত্রকার ছিলেন তাঁর ৪৯ সংখ্যক পত্রটি পাঠ করলে সহজেই অনুমান করা সম্ভব। এখানে কী সুন্দর একটা চিত্রকল্প রচনা করেছেন—"কলকাতায় অনিদ্রার রাত্রি মস্ত একটা অন্ধকার নদীর মতো খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে ;...এখানকার রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো...।" এ ধরনের চিত্রকল্পই আসলে ছিন্নপত্রকে পত্রসাহিত্যে উন্নীত করেছে। অনেকদিন পরে মেঘ কেটে রৌদ্রে দশদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, প্রকৃতি যেন স্নানের পর নতুন ধোওয়া বাসন্তী রঙের কাপড়টি পরে পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখে ভিজে চুলটি মৃদু মন্দ বাতাসে শুকোচ্ছিলেন।" (৮৯) এমন উপমা, চিত্রকল্প, রচনাশৈলী বাংলা তথা সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে বড়